আলপনার রঙে জড়িয়ে ঐতিহ্য

ঋষিকা

দুই আঙুলে রঙ নিয়ে কিংবা তুলি রঙে ভিজিয়ে নিয়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা। রঙিন সেই নকশা বলে মনের কথা। কখনো বলে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের কথা, কখনো বা বলে জীবন-জীবিকার গল্প। এরই নাম আলপনা। বাড়ির আঙিনা, চৌকাঠ, বিয়ের পিঁড়ি, পূজামণ্ডপ এমন সব জায়গায় সাদা আলপনার চল আছে। এটি মূলত ক্ষণস্থায়ী লোকশিল্প। প্রচলিত নানা অনুষ্ঠান ও গৃহসজ্জার জন্য আলপনা আঁকা হয়। আলপনার সঙ্গে বাংলার নারীদের অন্যরকম একটি সম্পর্ক। অনেক আগে থেকেই বাংলার নারীরা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আলপনার আঁকছেন।

বাংলায় আলপনা দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। আলপনা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ আলিম্পানা থেকে। আলপনা সাধারণত মেঝেতে করা হয়। আলপনার মোটিফ এবং নকশা সাধারণত স্টেনসিল বা প্যাটার্ন ব্যবহার না করে মুক্ত-হস্ত শৈলীতে আঁকা হয়। ফুলের নকশার পাশাপাশি নির্দিষ্ট দেবতাদের প্রতিনিধিত্ব করা আলংকারিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

সম্প্রতি ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে তৈরি চলচ্চিত্র কাজলরেখায় বাংলার আলপনা শিল্পের বেশকিছু নিদর্শন উঠে এসেছে। আলপনার একটা গ্রামীণ ইতিহাস আছে। পদ্ম, ধানের গুচ্ছ, বৃত্তায়িত রেখা, সূর্য, মই, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, শ্রীকৃষ্ণের শিশু পদচিহ্ন, মাছ, পান, শঙ্খ লতা ইত্যাদি বিষয়বস্তু হিসেবে আলপনায় আঁকা হয়। সাধারণত চালের গুঁড়া পানি মিশিয়ে ছোট এক টুকরা কাপড় কিংবা পাটের টুকরা ভিজিয়ে নিয়ে অনামিকা দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। অনেককাল আগে থেকে বাংলার আলপনায় চিরাচরিতভাবে ভেজা চাল গুঁড়া সাদা রঙ হিসেবে ব্যবহার হতো। এ ছাড়া তেল-সিঁদুর লাল এবং হলুদ বাটা হলুদ রঙ হিসাবে ব্যবহার হতো। আলপনার ছবিগুলো পুরু রেখায় তৈরি ও দ্বিমাত্রিক। সাধারণত মেঝের ওপরই আলপনা করা হয়। অনেক পণ্ডিতই ব্রত ও পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলপনাকে প্রাক-আর্য সময়ে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। তবে বর্তমান যুগে মুসলমানরাও বিয়ে, অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আলপনা অঙ্কন করে থাকে। আধুনিক আলপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিমূর্ত, আলংকারিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও মিনারসংলগ্ন সড়কগুলিতে আলপনা আঁকা হয়। প্রচলিত রীতির আওতার মধ্যে থেকেও অনুষ্ঠান, পটভূমি ও শৈল্পিক কারুকার্যে আলপনার রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়।

২০১৭ সালে ভারতে কলকাতার নদীয়া জেলার ফুলিয়ায় বিশ্বের বৃহত্তম যে আলপনাটি আঁকা হয়েছিল তার দৈর্ঘ্য ছিল ২.৭৩ কিলোমিটার। তবে নদীয়ার আগে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলপনার রেকর্ডটি ছিল বাংলাদেশের দখলে। সেটির দৈর্ঘ্য ছিল ১.৫ কিলোমিটার। এরপরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখতে আবারও গাইবান্ধার শিক্ষার্থীরা ১০ কিলোমিটার আলপনা আঁকার আয়োজন করে। আর এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আবার ফিরে পায় হারানো গৌরব। পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব গাইবান্ধার (পুসাগ) উদ্যোগে গাইবান্ধা থেকে বাদিয়াখালি-ফুলছড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ কিলোমিটার সড়কজুড়ে আলপনা আঁকা হয়।

বাংলাদেশে আলপনার ইতিহাস অনেক পুরানো। সেই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারীদের অবদান। একটি গ্রাম কয়েক বছর আগে আবারও

আলোচনায় এসেছিল সে গ্রামের নারীদের আলপনা শিল্পের কারণে। টিকইল গ্রামের গৃহবধূ দেখন বালা প্রথম আলপনা আঁকা শুরু করেন। তার দেখানো আলপনা অল্প সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে পুরো গ্রামে। রাজশাহী শহর থেকে রেলপথে টিকইল গ্রামের দূরত্ব দুই ঘণ্টার। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার নেজামপুর ইউনিয়নের এই গ্রামের প্রায় সব মানুষই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সেই গৃহবধূর হাত ধরেই একটা সময় ওই গ্রামের প্রতিটি ঘরে নারীরা আলপনা আঁকা শুরু করেন। তারা সারা বছর আলপনা আঁকেন। প্রতিটি বাড়ির দেয়ালেই আঁকা থাকে আলপনা। ফুটে ওঠে পাখি, মাছ, লতাপাতা। প্রতিটি বাড়িই যেন এক একটি রঙিন ছবি। এই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আলপনার স্মৃতি ৬০ বছরের। তারা নিজেরাই রঙ বানাতেন। বরেন্দ্রর লাল মাটি ধুয়ে আবির বের করে তৈরি করা হতো লাল রঙ। খড়িমাটি অথবা চকের গুঁড়া দিয়ে তৈরি করা হতো সাদা রঙ। সাদা মাটি পানির পাত্রে রাখলে পানির ওপর চর পড়ত। সেই চরকেই সাদা রঙ হিসেবে আলপনায় ব্যবহার করা হতো। এ ছাড়া পানিতে চাল ভিজিয়ে পাটায় পিষে দেয়ালে দিলে সাদা রঙ হতো। তবে এই রঙ বেশি দিন থাকত না। তাই পরবর্তীতে আলপনা আঁকতে তারা বাণিজ্যিক রঙ ব্যবহার শুরু করেন।

ঐতিহ্যগতভাবে গ্রামীণ নারীদের ডোমেইন, আলপনা মোটিফগুলি আধুনিক ভারতীয় শিল্পে খুব প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে। যামিনী রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবী প্রসাদ এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের প্রথম দিকের কাজে যা লক্ষ্য করা যায়। যদিও সমসাময়িক বাংলায় আলপনা ধর্মীয় উৎসবের অংশ হিসেবে আঁকা হয় যেমন দুর্গা পূজা। হিন্দু পরিবারে আলপনার প্রতীকী নকশাসহ ধর্মীয় মোটিফ থাকতে পারে যা ধর্মীয় উৎসব এবং নির্দিষ্ট দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আলপনায় প্রায়ই প্রকৃতি থেকে আঁকা জ্যামিতিক বা প্রতীকী নিদর্শন থাকে। আলপনার ব্যবহার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ঐতিহ্যবাহী বিয়ে, নামকরণ অনুষ্ঠান ও উৎসবগুলোতে সাজসজ্জা এবং অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আলপনা ব্যবহৃত হতে পারে। আবার মোটিফগুলি সবসময় একটি কাঠামোগত বিন্যাসে সংগঠিত হয় না প্রায়ই মুক্ত আকারে থাকে, যার সঙ্গে ফুলের নকশা এবং জ্যামিতিক নিদর্শন থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে উপবাস সময়কালের সমাপ্তি চিহ্নিত করার জন্য আলপনা আঁকা হয়। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় আঁকা নকশার মোটিফও ভিন্ন থাকে। যেমন রৈখিক নকশা, সাধারণত মেঝেতে বাড়ির ভেতরে আঁকা হয়। যা সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী যে ঘরে প্রবেশ করেছেন তা নির্দেশ করে। আবার ঋতুভিত্তিক উৎসবের আলপনাও ভিন্ন হয়। যেমন বর্ষাকালে ধান বপনের প্রতীক হিসেবে ধানের গুচ্ছ আলপনার হিসেবে আঁকা হয়।

আলপনার একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। ঐতিহ্য রক্ষা করা একটি জাতি ও সমগ্র বিশ্বের দায়িত্ব। বর্তমানে ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য বিশ্ব নানা ভূমিকা ও ব্যবস্থা নিচ্ছে। সেই হিসেবে আলপনা সংরক্ষণ ও এই শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করা দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতি রক্ষার জন্য জরুরি। এ শিল্পের রূপকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ভারতীয় জাতীয় ট্রাস্ট ফর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ এবং দারিচা ফাউন্ডেশনের মতো বেশ কয়েকটি অলাভজনক সংস্থা প্রচেষ্টা শুরু করে। শিল্পের রূপকে পুনরুজ্জীবিত করার আধুনিক প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে পাবলিক ইভেন্ট যেখানে স্বেচ্ছাসেবকগণ বিভিন্ন রাস্তায় বড় বড় আলপনা আঁকেন। সেইসঙ্গে দুর্গা পূজার সময় আলপনা আঁকা প্রতিযোগিতা হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে দলের প্রতীক সংবলিত আলপনার ব্যবহার করছে। সুকুমারী দেবী, কিরণ বালা দেবী এবং যমুনা সেনসহ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিল্পী আলপনা সৃষ্টিকে শিল্পকলা হিসেবে শেখান। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের কলাভবনে তারা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এ ছাড়া নন্দলাল বোস, সত্যজিৎ রায়, দেবী প্রসাদের মতো বরেণ্য ব্যক্তিগণ তাদের কাজের মাধ্যমে আলপনাকে তুলে ধরেছেন সকলের সামনে। বাংলাদেশে ভাষা দিবস, পয়লা বৈশাখ সহ জাতীয় দিবসগুলো উদ্‌যাপনের জন্য আলপনা আঁকা হয়।